ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 195-201
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.023

কাজী নজরুল ইসলামের ‘বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি’ : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়

তাপস মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the world of modern Bengali poetry, Kazi Nazrul Islam is a name that remains unforgettable. Without him, the discussion of Bengali poetry would be incomplete. Though not educated in the traditional academic system, his poetry has introduced a new dimension to Bengali literature, earning eternal glory for all Bengalis. The world poet Rabindranath Tagore was also deeply impressed by Kazi Nazrul Islam's poetic talent. However, Nazrul did not adhere to conventional poetic styles. Instead, he used his talent to voice rebellious words for the common people, earning him the title of the ‘Rebel Poet.’ But this was not his only identity. His personality also reflected a deep love and connection to nature. While rebellion marks the early phase of Nazrul's poetry, love and nature consciousness emerge in his later works, where love and passion intertwine. A beautiful combination of love and nature consciousness can be seen in his poem ‘Bataayan-Pashe Gubak Tarur Saari’.

Keywords: Nazrul Islam, Bengali Literature, Consciousness, Love & Nature.

> “আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু’জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।”[১]

—কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই মন্তব্যে কোনো সহৃদয় পাঠক মতান্তর পোষণ করবেন না। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসাবে নজরুল ইসলামের পরিচিতি সর্বজন বিদিত। তবে তাঁকে শুধুমাত্র ‘বিদ্রোহী কবি’র আখ্যায় ভূষিত করলে মতান্তর সৃষ্টি হওয়ায় স্বাভাবিক। কারণ তাঁর কবি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে ‘বিদ্রোহ’ বিষয়টি তাঁর কিছু কাব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তাই বলে সকল কাব্যের বিষয়ই ‘বিদ্রোহ’ নয়। প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার প্রকাশও তাঁর কোনো কোনো কাব্যের মধ্যে লক্ষ করা যায়। সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের কাব্যগুলির ভাববস্তু বিচার করে তিনটি সুস্পষ্ট ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ‘অগ্নিবীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘ফণি-মনসা’, ‘জিঞ্জীর’, ‘সন্ধ্যা’ ও ‘প্রলয়-শিখা’ কাব্যে দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও হতাশার প্রকাশ ঘটেছে।

'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'চক্রবাক'-এ প্রকাশিত হয়েছে কবির মানবিক প্রেম, বাৎসল্য ও প্রকৃতি প্রেম। আর 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' হল জীবনী বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলামের কবি জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রেমমূলক কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'চক্রবাক'(১৯২৯)। এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা—'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি'। কবিতাটি 'কালিকলম' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে ও 'সঞ্চিতা' কবিতা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রচনার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে শোনা যায়—কবি চট্টগ্রামে হাবীবুল্লাহ বাহার ও সামসুন্নাহারদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য গেলে পূর্ব বাংলার অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করে। কবি যে ঘরে থাকতেন তার জানালার পাশে পুকুর পাড়ে থাকা সুপারি গাছের সঙ্গে কবির নীরব সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই আসন্ন বিদায় মুহূর্তে কবি পূর্ব বাংলার মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের সেই সখ্যতা ভুলতে না পারার জন্যই প্রকৃতি-প্রেম ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্যেই 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হল প্রেম-বিরহ। আলোচ্য কবিতাটিতেও সেই সুরই অনুভূত হয়। এখানে কবি প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়াকে একাকার করে দেখেছেন। তাই এই কবিতায় বিদ্রোহী কবির কোদণ্ড টঙ্কার শোনা যায় না। তার পরিবর্তে—

> "এখানে ওঠে সারেঙ্গীর টুংটাং, গজলের গুনগুনানি; আছে সজল মেঘের ছায়া, কর্ণফুলীর ছলছল ব্যথা, চক্রবাক-চক্রবাকীর মুখর বিরহ।"[২]

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি যেন 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা। 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনায় প্রেমের কবিতার পরিমাণ বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু যাঁরা নজরুলের জীবন সম্পর্কে অবহিত তাঁরা এর স্বাভাবিকতায় সন্দিহান হন না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বিদ্রোহী প্রেমিক' হিসাবে কবি নজরুল ইসলামের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—

> "এখন খুব স্পষ্ট গলায় বলা দরকার যে, বিদ্রোহ তাঁর কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয়। তাঁর কবিতার আর একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা। তাঁর মতন এতটা জোরালো রোল তুলে সম্ভবতঃ আর কেউ কখনও বিদ্রোহের দামামা বাজাননি। ঠিক কথা। কিন্তু প্রেমের কথাই বা তাঁর মতন এমন মধুর গলায় আর ক'জন কবি বলতে পেরেছেন? অনেকের ধারণা বিদ্রোহী কিংবা যোদ্ধার গলায় প্রেমের কথা ঠিক মানায় না। খুবই ভুল ধারণা। যোদ্ধারাই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য তার প্রমাণ দেবে।
>
> মাস কয়েক আগেকার কথা। রেডিয়োতে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতি শুনছিলাম। দু'রকমের গানই সেদিন গাওয়া হল। বীরত্বব্যঞ্জক এমন গান, যা শুনলে কাপুরুষের রক্তেও আগুন ধরে যায়। তার পাশাপাশি এমন মিঠে গজল, যা শুনলে বীরপুরুষের চক্ষুও একটি ললিত স্বপ্নের নেশায় আপনা থেকেই বুজে আসে। এই হ'ল নজরুলের ষোল-আনা পরিচয়। আট আনা বিদ্রোহ, আট আনা ভালবাসা।"[৩]

কবি নজরুল ছিলেন যৌবন উচ্ছ্বাসে ভরপুর একজন প্রাণবন্ত মানুষ। তাঁর ব্যক্তিজীবনে বারবার প্রেম এসেছিল। স্বাভাবিক কারণেই কবির সব প্রেমানুভূতি স্বীকৃতির যোগ্য ছিল না। কবির প্রেমাকুতিও সর্বক্ষেত্রে মিলনধন্য হয়নি। বরং বলা যায় নজরুলের প্রেমানুভাবে বিরহ বেদনা চিরলগ্ন ছিল। পরিণামে তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানে প্রেমের বিষন্ন বেদনাকে কবি রূপদান করেছিলেন। 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। কবির সংক্ষিপ্ত প্রবাস জীবনে দীঘল সবুজ সুপারি বৃক্ষরা কবির বাতায়ন পথে নিত্য দৃষ্ট হত। আর সেই চকিত চাউনির মধ্যদিয়ে কবিচেতনায় আন্দোলিত সুপারি বৃক্ষের সারি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবির চোখে এরা পরিয়ে দিয়েছিল মায়া কাজল। প্রবাস

জীবনের শেষে এই মিলন মেলা ভাঙবার দিনে কবিচিত্ত বেদনায় টনটন করে উঠেছিল। কবি তাঁর হৃদয়ানুভবকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেও মূক তরুর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাননি। তাই এক অচরিতার্থ ভালোবাসার বেদনা নিয়ে কবি বিদায় প্রার্থনা করেছেন।

কবিতাটির অন্তরঙ্গ পাঠে অনুভব করা যায় গুবাক তরুর বহিরঙ্গ আচ্ছাদনের অন্তরালে কবির মানবিক প্রিয়া সংগুপ্ত হয়ে আছেন। গুবাক তরুর সারি আর কবির গোপন প্রিয়ার স্মৃতি এই কবিতায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবির ভাষায়—

"... তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।

তব ঝির্-ঝির্ মির্-মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচল খানি!
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর ছাওয়া!"[৪]

একটু স্পর্ধার প্রকাশ ঘটলেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে, প্রেমের কবিতা হিসাবে 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি সংকীর্ণ অর্থে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র কবিতা। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।"[৫]

(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ ১৫/১৪৭)

অর্থাৎ প্রেমের উৎকর্ষতা বশত প্রিয়ের অতি সন্নিকটে থেকেও বিরহ জনিত কারণে যে আর্তি তাই হল প্রেমবৈচিত্ত্য। আলোচ্য কবিতাটিতেও কবি গুবাক তরু বা গোপন প্রিয়ার নিকটবর্তী থেকেও প্রেমোৎকর্ষতা বশত বিরহ চেতনাতেই আচ্ছন্ন হয়েছেন। তবে 'বৈষ্ণব পদাবলি'র প্রেমবৈচিত্ত্যের সঙ্গে এর তফাতটুকুও লক্ষণীয়। সেখানে পূর্ণ মিলনের মুহূর্তে অনতিক্রম্য বিচ্ছেদ বেদনা জাগ্রত হয় কিন্তু বর্তমান কবিতায় সেই পূর্ণ মিলন অনুপস্থিত। কবির আক্ষেপ—

"জানি —মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপানি!"[৬]

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটির অনন্যতা এইখানে যে বাতায়নবর্তিনী সারিবদ্ধ গুবাক তরুর প্রতি কবির হৃদয়-ভাবনা উৎসারিত হলেও তারই মধ্য দিয়ে কবির এক গোপন নীরব প্রিয়ার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অথচ সেই একান্ত মানবিক অভিজ্ঞতার স্পর্শে কবির রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রেমের জলবিম্বটি ভেঙে যায়নি। ষোলোটি স্তবকে বিধৃত এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি তাঁর নিশীথ জাগার সাথীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন —

"আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি!..."[৭]

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তটি এক অসাধারণ প্রাকৃতিক চিত্রকল্পে রূপময় হয়ে উঠেছে। মিলনের নৈকট্যময় রাত্রির অবসানে চাঁদ যখন পাণ্ডুর অন্ধকারে এলোচুল সংস্কৃত করে দূর বনান্তে

প্রায় বিলীন, সে সময় কবি তাঁর বেদনাতপ্ত ললাটে অনুভব করেছেন হৃদয়ের মৃদু ব্যজন। তৃতীয় স্তবকে রাত্রির স্বপ্ন শেষে কবি চোখ মেলে চেয়ে দেখেছেন তাঁর শয্যাপ্রান্তে যেন নিস্পন্দ নয়ন মেলে দাঁড়িয়ে আছে গুবাক তরুর সারি। চতুর্থ স্তবকে কবি গুবাক তরুর শ্রেণিকে তাঁর পীড়িত চিত্তের শুশ্রূষাকারিনী রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে দেখা যায় নিশীথ জাগরণের মুহূর্তে এই গুবাক তরুর সারি যেন তাদের আন্দোলিত পত্রপুঞ্জ নিয়ে কবির বেদনা-বিধুর চিত্তে সুশীতল শুশ্রূষা প্রসারিত করে দিত। বিরহ তাপিত কবিচিত্তে শ্যামলী প্রিয়ার রূপাবয়ব নিয়ে এই গুবাক তরুর শ্রেণি কবিকে নিয়ত সঙ্গদান করত। সপ্তম ও অষ্টম স্তবকে কবি গুবাক তরুর রূপকে তাঁর গোপন প্রেম হতাশাকেই বুঝি ভাষারূপ দিয়েছেন। কবির বক্তব্য— গভীর প্রীতিবশত কবি বারবার তাঁর চিত্তের শুশ্রূষাকারিনীর দিকে, তাঁর নিশীথ রাত্রির জাগরণের সাথীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেই হাত কেউ ধরেনি। অর্গলিত বাতায়নে ঠেকে তা বারবার ফিরে এসেছে। আমরা অনুমান করতে পারি এই রুদ্ধ বাতায়ন আসলে সমাজ শাসনের প্রতীক। আমাদের সমাজে মানবিক আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ শাসনে প্রতিহত হয়। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে যে গোপন প্রেমিকার অশরীরী স্পর্শ দেহ-মনে নিয়ত অনুভব করেছেন সেই গোপন প্রিয়ার কাছ থেকে উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিকতার নানা বাধা দুজনেরই হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের বাতায়ন পথকে রুদ্ধ করেছে। এই অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা নিয়ে সমাগত বিদায় লগ্নে কবির মনে আকুতি জেগেছে। তাইতো কবিতাটির নবম স্তবকের প্রথমেই কবি বলেছেন —

"— আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন!"[৮]

কবির হৃদয়ে এই মিলনাবেগ উচ্ছলিত হয়ে উঠলেও কবি তাঁর জীবনের অদৃষ্ট ললাট লিপি পাঠ করে জেনে নিয়েছেন তাঁর গোপন প্রেমিকার সাথে কোনোদিনই মুখে মুখে জানাজানি সম্ভব হবে না। তাঁর জীবনের অনিবার্য বিধিলিপি —

"বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি!"[৯]

কবিতাটির দশম স্তবকে একটু ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। কবির স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়ে কবি তাঁর গোপন প্রেমিকাকে 'যাহা নও তাই ক'রে' হৃদয় ভরে অনুভব করেছেন। এই মুহূর্তে কবির একমুখীন আবেগ যেন ধরা পড়েছে। গোপন প্রেমিকার উপযুক্ত সঙ্গ না পেয়ে প্রেমিক কবি মনে মনে প্রেমের অমরাবতী রচনা করে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। বাস্তব জীবনে স্বেদ বিগলিত বাহুবন্ধনে প্রেমিকাকে কাছে না পেলেও কবি তাঁর হৃদয় ভাবনার অমরলোকে গোপন প্রেয়সীকে চির অক্ষয় করে পেতে চেয়েছেন। তাই কবির ঘোষণা —

"তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!..."[১০]

পরবর্তী দুটি স্তবকে কবির গোপন প্রিয়ার স্বরূপটি গুবাক তরুর রূপকল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তরু ও বিহঙ্গের সম্পর্ক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবি এই কথা ঘোষণা করতে চেয়েছেন যে, ইতিপূর্বের প্রেম-অভিজ্ঞতাহীন প্রেমিকার হৃদয়প্রান্তে তিনি তাঁর প্রথম প্রণয় লেখাটি রচনা করতে পেরেই ধন্য হয়েছেন—

"তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।..."[১১]

দূর থেকে ভালোবেসে জীবনের প্রথম প্রণয় নিবেদন করে কবি কৃতার্থ হতে চেয়েছেন। এই প্রেম মিলনধন্য হয়নি বলে কবি কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তিনি বিরহানন্দে মগ্ন হতে চেয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন মিলনহীন এই প্রেমের স্মৃতি তাঁর চিত্তাকাশে দগ্ধ ধূপ গন্ধের মতো নিয়ত বিরাজমান হয়ে থাকবে।

কবিতাটির ত্রয়োদশ স্তবকে কবির প্রেমাবেগের ইতিহাস স্পষ্টতা পেয়েছে। কারণ এখানে কবি গুবাক তরুর রূপকে তাঁর গোপন প্রিয়ার কাছে এই বেদনাস্নিগ্ধ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছেন —

"...তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে —দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি'?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি',? "[১২]

অনুভব করা যায় আলোচ্য কবিতায় যে কবিপ্রিয়ার সাক্ষাৎ আভাসে ইঙ্গিতে মেলে সে কবিপ্রিয়ার সঙ্গে কবির দেওয়া নেওয়ার সেতুটি কোনোদিনই রচিত হয়নি। একমুখীন আবেগ নিয়ে সেই নারীর নানা ব্যবহারে কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রেমের চকিত প্রকাশ। স্বাভাবিকভাবেই কবির অতৃপ্ত মন বিদায়ের ক্ষণে হলেও প্রিয়তমার প্রেমের স্বীকৃতি পেতে চেয়েছে।

কবিতাটির চতুর্দশ স্তবকে কবি ভাবনার পরিবর্তন লক্ষণীয়। ক্ষণিকের অতিথির বিদায় শেষে গুবাক তরুর স্মৃতিচারণের রূপকল্পে কবি তাঁর দূরবর্তিনী প্রেমিকার কাছে এক অস্ফুট আবেদন রচনা করেছেন— যেদিন আকাশের চাঁদ ঝরে পড়বে গাছের পাতায় পাতায়, আলোর উৎস জাগবে বিশ্ব ভুবনে; সেদিন কি এই বন্ধ বাতায়নশূন্য কক্ষটির দিকে চেরে গুবাক তরুর স্মৃতি উদ্বেলিত হবে? বিস্বাদ হয়ে যাবে কি আলোক চন্দ্রিমা? একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আসলে কবি তাঁর প্রেমিকা নারীর উৎসব মুখরিত দিনেও তাঁর স্মৃতিপটে সংকীর্ণ উপস্থিতি কামনা করেছেন। আর এর মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে মানবের চিরন্তন আকুতি এবং অমরতার আকাঙ্ক্ষা। এই অমরতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মানুষ শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন; রচনা করেন স্মৃতিস্তম্ভ। কবিও তাই তাঁর নীরব উদাসীন প্রেমিকার সঙ্গে মুখে মুখে কথা কইতে না পারার বেদনাকে ভুলে যেতে চেয়েছেন ক্ষণিক স্মৃতির সুনিশ্চিত আশ্বাসে।

কবিতাটির পরবর্তী স্তবকে কবির বক্তব্য থেকে আমরা সুসংগতভাবে মনে করতে পারি কবির গোপন প্রেমিকা তাঁর বাস্তব জীবনে সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিনী ছিলেন না। কবি তাই বেদনা রক্তিম কণ্ঠে বলেছেন —

"তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!"[১৩]

কবিতাটির অন্তিম স্তবকে প্রেমের প্রতিদান না পাওয়ার বেদনায় কবির মনের অভিমান ঝলসিত হয়েছে। কবি তাঁর অচরিতার্থ প্রেমের গোপন নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে অভিমানে ক্ষুব্ধ এই বাণী উচ্চারণ করেছেন —
"ভুল ক'রে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি' "[১৪]
কিংবা
"খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে!"[১৫]

আলোচ্য কবিতাটি নজরুল ইসলামের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই অনবদ্যতার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, কবিতাটির মধ্যে ভাব প্রকাশের শৃঙ্খলা ও রূপ রচনায় কবির শিল্পী সুলভ স্থৈর্য অবশ্য অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার যে বেণীটি কবি রচনা করেছেন তা আদ্যন্ত সুসংবদ্ধ; প্রেম ও প্রকৃতি কোথাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে একে অপরকে গৌণ বা শিথিল করে দেয়নি। তৃতীয়ত, কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগের যে আন্দোলন অনুভব করা যায় তা মাত্রাবৃত্তের নাতিদীর্ঘ পর্ব, নাতিমন্থর লয়ে চমৎকার

ভাষারূপ পেয়েছে। কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়। এখানে বাচ্য হল প্রকৃতি প্রীতি আর ব্যঞ্জনা হল মানবিক প্রেম। কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর গোপন প্রেমিকার শরীরী রূপ, স্বভাব-প্রকৃতি ও প্রণয় বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করেছেন। কবির গোপন প্রিয়া কবি চিত্তে কতটা স্থান লাভ করেছিলেন তা একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রকল্পে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে —

"জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!"[১৬]

কবির প্রেমিকা যে এক অনাঘ্রাতা কুসুম; তাঁর জীবনে যে এখনও কোনো অতিথির পদসঞ্চার ঘটেনি তা কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন অতি চমৎকার চিত্রকল্পের মাধ্যমে। চিত্রকল্পটি পরিপূর্ণভাবে প্রাকৃতিক অথচ এর অন্তরাল থেকে মানবিক প্রেমের ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় —

"হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রকুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি'।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগে নি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালবাসি'!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।....."[১৭]

বলা বাহুল্য প্রাকৃতিক চিত্রকল্প রচনায় কবির কৃতিত্ব যেমন ধরা পড়েছে ঠিক তেমনি এর অন্তরাল থেকে ব্যঞ্জিত হয়েছে এক নারীর জীবন ইতিহাস। ষোলোটি স্তবকে নির্মিত কবিতাটি প্রাকৃতিক চিত্রকল্পে ও প্রেমের ব্যঞ্জনায় অসাধারণ রূপে সার্থক। কবি সমগ্র কবিতাটির মধ্যে গুবাক তরুকে লক্ষ করে অচরিতার্থ প্রেমের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার মৃদু সৌরভ পাঠকের অন্তরাকাশকে ভরিয়ে রাখে। এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে কবির অনুভূতির গাঢ়তায় ও সরল প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ নির্ভর প্রকাশ ভঙ্গিমার কারণে। কবিতাটি পাঠ করলে অতি সহজে অনুভব করা যায় এই কবিতাটি আসলে এক অকপট সরল প্রেমিক হৃদয়ের ব্যর্থ প্রেমের বিধিলিপি। কবিতাটি 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা। চক্রবাক দম্পতি কিংবদন্তি প্রসিদ্ধ চিরবিরহী পক্ষী যুগল। আলোচ্য কবিতাতেও এই চিরবিরহের বার্তায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি যাকে স্বপ্নে নিশীথ জাগার সাথী হিসাবে পেয়েছেন সে কখনও এই বাস্তব মাটির বুকে 'মুখে মুখে' তাঁর হৃদয়ের কথা কবিকে জানায়নি। এক অনতিক্রম্য বিচ্ছেদ বেদনায় কবির সংকীর্ণ মিলন উৎসব ম্লান হয়ে গেছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা প্রেমিকার নৈকট্য লাভের দিনগুলিকেও বিষে নীল করে দিয়েছে। তবুও নীলকণ্ঠ কবি দগ্ধ ধূপের মত পুড়ে পুড়েও আপন আন্তরিক প্রেমানুভবের সৌরভে ভরে দিতে চেয়েছেন প্রেমিকার চিত্তাকাশ; রচনা করতে চেয়েছেন বিরহানন্দের অমরাবতী। সুতরাং প্রাকৃতিক চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত প্রেম-বিরহকে নিখিল মানবের প্রেম-বিরহে রূপান্তরিত করার মধ্যেই কবিতাটির কাব্য সৌন্দর্য অনুভব করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ১৬ ই মে ১৯৮৭, পৃ. ৩
২. গুপ্ত, সুশীলকুমার, 'নজরুল-চরিত মানস', ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৭, পৃ. ১১১
৩. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), 'নজরুল স্মৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৪. ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা-৭০০০০৬, অষ্টসপ্ততিতম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ২১৩-২১৪
৫. ভট্টাচার্য, দেবিদাস, 'বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস', করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৭৪, পৃ. ৩৪৪
৬. ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৭. তদেব, পৃ. ২১৩
৮. তদেব, পৃ. ২১৪
৯. তদেব, পৃ. ২১৪
১০. তদেব, পৃ. ২১৪
১১. তদেব, পৃ. ২১৫
১২. তদেব, পৃ. ২১৫
১৩. তদেব, পৃ. ২১৬
১৪. তদেব, পৃ. ২১৬
১৫. তদেব, পৃ. ২১৬
১৬. তদেব, পৃ. ২১৩
১৭. তদেব, পৃ. ২১৪-২১৫